অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থা

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই গণতন্ত্র ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে বোঝায়, যে শাসনব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না থেকে রাষ্ট্রের সব জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই তাদের সরকার গঠন করে। গণতন্ত্র হলো এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার থাকে। এ ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও কল্যাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিভিন্ন স্থানীয় পরিষদ ও এখানে জাতীয় সংসদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।এজন্যে সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি এবং নির্বাচনি আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তির বিধান রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র, নির্বাচন ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- গণতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নির্বাচনি আচরণবিধি বর্ণনা করতে পারব;
- নির্বাচনি আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে আগ্রহী হব।

গণতন্ত্রের ধারণা

আমেরিকার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– গণতন্ত্র হলো, 'জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা (A Government of The people, by the people and for the people.)। অধ্যাপক গেটেলের মতে, 'যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র।' সাধারণ অর্থে, গণতন্ত্র হচ্ছে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে গঠিত ও পরিচালিত সরকার।

এর অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর মতামত ও স্বার্থকে উপেক্ষা করবে, বরং গণতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সুতরাং গণতন্ত্র বিশ শতকের একটি জনপ্রিয় ধারণা, যা বর্তমানে সরকার পরিচালনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই গণতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত অধ্যয়নযোগ্য বিষয়াবলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। গণতন্ত্র সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে। গ্রিসের নাগরিক সমাজ গণতন্ত্র বলতে বুঝত এমন একটি রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যাতে গোটা নাগরিক সমাজ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এথেন্সীয় গণতন্ত্র পরবর্তীতে চলমান থাকেনি। মধ্যযুগে ধর্ম ও রাজার দ্বৈতশাসন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অনেকটা সময় কেটে গেছে। দীর্ঘকাল পরে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম ঘটে। উনিশ ও বিশ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকের গণতান্ত্রিক ভাবধারার উৎসমূল হিসেবে ইংল্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে গণতন্ত্রের বিকাশ এতই সাফল্য লাভ করেছে যে, আধুনিক সভ্যতা গণতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

গণতন্ত্র সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে কার্যকর হয়, যথা: (১) প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র ও (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

যে শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর ধার্য, বিচারকার্য পরিচালনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করত। সে সময় নাগরিকের ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের সকলেই নাগরিকত্বের সম্মান পেত না। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল। এর জনসংখ্যাও বেশি। এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ কম। তবে সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি অঞ্চলে আংশিকভাবে এখনও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু আছে।

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

পরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করার পদ্ধতিকেই বোঝায়। এ ধরনের গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত নাগরিকগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন না। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়নসহ শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই প্রচলিত রয়েছে।

গণতন্ত্রের দোষ-গুণ

গণতন্ত্রের সুন্দর দিকগুলো হলো গণতন্ত্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হলো দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। এ শাসনব্যবস্থায় সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা থাকে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হলো জনমত দ্বারা পরিচালিত সরকার। স্বৈরাচারী পন্থায় নিয়ন্ত্রণ, দমন, নিপীড়নমূলক আচরণ এ শাসনব্যবস্থায় কোনোক্রমেই কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা স্বীকৃত। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক

চেতনার সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থায় সরকার জনগণের সরকার হিসেবে বিবেচিত। জনগণের আস্থা হারালে এ সরকার টিকে থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার আত্মবিকাশের সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করে। তদুপরি গণতন্ত্র হচ্ছে কল্যাণকামী সরকার। এর মূল উদ্দেশ্যই হলো জনকল্যাণ সাধন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বেশকিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিও রয়েছে। প্রাচীনকালের প্রখ্যাত মনীষী ও দার্শনিকগণ, যেমন– প্লেটো ও অ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে মূর্খ বা অযোগ্যের শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হিসেবে গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে অজ্ঞ, অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। ফলে উপযুক্ত লোকের অভাবে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না এবং শাসনকার্য পরিচালনায় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বাস্তবে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। সংখ্যালঘুরা আইনসভায় তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না। ফলে তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকার উদাসীন থাকতে পারে। গণতন্ত্রে বহু পরস্পরবিরোধী মত ও ধারণা দেখা যায়। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জাতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে। অনুন্নত দেশগুলোতে সরকারি দল নিজ দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। ফলে নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। এতে করে গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। গণতন্ত্র তুলনামূলক ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা। ঘন ঘন নির্বাচনের ব্যবস্থা, জনমত গঠন, ব্যাপক প্রচারকার্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

রাজনৈতিক দল

আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করেই জনমত গঠন, দলীয় আদর্শের প্রচার, সমর্থকগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

সাধারণ ভাষায়, রাজনৈতিক দল বলতে একটি সংগঠিত নাগরিক সমষ্টিকে বোঝায়, যারা দলীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে।

অধ্যাপক গেটেল রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'রাজনৈতিক দল বলতে কমবেশি সংগঠিত একদল লোককে বোঝায়, যারা রাজনৈতিক এককরূপে কাজ করে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। সংগঠন, কর্মসূচি প্রদান ও ক্ষমতা অর্জন রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য।' এডমন্ড বার্ক এর মতে 'রাজনৈতিক দল এরূপ একটি জনসমষ্টি যারা কিছু ঐক্যবদ্ধ নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।'

রাজনৈতিক দল সাধারণত একক কিংবা একদল বিশিষ্ট বা সৃজনশীল নেতৃত্বের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মাধ্যমে নাগরিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে, সেই সমস্যাগুলো সমাধানে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থায় জনমত গঠন এবং বৈধ উপায়ে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ একটি জনসমষ্টি হলো রাজনৈতিক দল। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতির পাশাপাশি সাংগঠনিক দৃঢ়তা এবং দলীয় সদস্যদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে রাজনৈতিক দল তৎপরতা প্রদর্শন করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চেষ্টা করে, সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।'

সুতরাং, রাজনৈতিক দল এমন একটি জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য

রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো–

১. রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা;

২. রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কিছু নীতিমালা ও পরিকল্পনা জনগণের নিকট পেশ করে জনসমর্থন সৃষ্টি করা;

৩. দলীয় নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা এবং জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা;

৪. বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান শর্ত। অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেছেন, 'আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন'। একটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যে ধরনের সরকার ব্যবস্থাই বিদ্যমান থাকুক না কেন, সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃত। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তাও গুরুত্ব সর্বাধিক। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার আলোকে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠন দলীয় নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই নীতিমালা ও কর্মসূচি সাধারণত রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে (ম্যানিফেস্টো) উল্লেখ থাকে।

> **কাজ**
>
> একক : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল কেন অপরিহার্য? উল্লেখ কর।
>
> দলগত : রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজগুলোর তালিকা তৈরি কর।

দলের নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য রাজনৈতিক দল সভাসমিতি, টকশো আয়োজনসহ পত্রপত্রিকায় মতামত ব্যক্ত করে তাদের নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে এবং জনসমর্থন সৃষ্টি করে।

দেশের জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন এবং তার পক্ষে দলীয় প্রচারকার্য চালানো রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মনোনীত প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করার জন্য রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থনে ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা চালায়।

রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করা। সাধারণত নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাই সরকার গঠন করে থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক দল তার দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে। নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে যে সকল দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না তারাই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল পার্লামেন্টে বিতর্ক, সরকারের নীতির সমালোচনা, মুলতবি প্রস্তাব উপস্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে সংসদকে কার্যকর রাখে। সংসদের বাইরেও বক্তব্য, বিবৃতি ও সমালোচনার মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারকে আইনের শাসন অনুশীলনে সহায়তা করে।

এ ছাড়া বিরোধী দল জনগণের সামনে সরকারের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচি তুলে ধরে। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনা এবং কার্যকর চাপে সারকারি দল জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়।

রাজনৈতিক দলের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় জনগণের মাঝে মিশে থাকে। সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ মানুষের কাছে তুলে ধরে। জনগণ তাদের মতামত ও অভিযোগ রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে সরকারের নিকট উত্থাপন করে এবং সরকারের করণীয় দাবি করে। মূলত রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বা সেতুবন্ধন রচনা করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিহার্য। জনগণের অভাব, অভিযোগ, দুঃখদুর্দশাকে চিহ্নিত করে তারা সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল হলো বিকল্প সরকার। সরকার সমর্থন হারালে বা কোনো কারণে পতন হলে বিরোধী দলের ক্ষমতা লাভ বা সরকার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক

গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয় হলো নির্বাচন। নির্বাচন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিন্তা করা যায় না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই। রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের মাধ্যমেই জনগণ তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে। এ প্রক্রিয়ায় জনগণ তাদের দৃষ্টিতে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে বৈধ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সম্পর্ক রয়েছে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জনগণ চাইলে পূর্ববর্তী সরকার ও দলকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যে সরকার বা দল জনগণের স্বার্থ বা জনমতের বিরোধিতা করে তার বা তাদের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে না। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের জবাব প্রদান করে। গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়। জনগণের সার্বভৌমক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে নির্বাচনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া

প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণই সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল এবং এর জনসংখ্যাও বেশি। সবার পক্ষে সরাসরি রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে জনগণ পরোক্ষভাবে এ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়।

নির্বাচন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়া। অন্যকথায়, যে প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দ

অনুযায়ী প্রতিনিধি বাছাই করে তাকেই নির্বাচন বলে। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই গোপন ব্যালটে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ ভোটদানের অধিকার ভোগ করেন তাদের ভোটার বা নির্বাচক বলে। সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সারা দেশকে কতকগুলো নির্বাচনি এলাকায় (constituency) ভাগ করা হয়। এভাবে প্রতিটি এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্ট বা আইনসভা গঠিত হয়। বাংলাদেশে নির্ধারিত ৫ বছর মেয়াদান্তে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৮.১ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুই প্রকার নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে, যথা: প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন। যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলা হয়। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু রয়েছে। আর পরোক্ষ নির্বাচন বলতে সাধারণত ঐ নির্বাচন পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে ভোটারগণ ভোট দিয়ে সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা গঠন করে। এ নির্বাচনি সংস্থা ইলেক্টোরাল কলেজ (electoral college) নামে পরিচিত। ইলেক্টোরাল কলেজ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

সংসদ নির্বাচনের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ এবং 'নির্বাচনি তফসিল' ঘোষণা করে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রার্থীরা প্রাথমিকভাবে মনোনীত হন। প্রধানত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন নিয়েই প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পান। স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। এছাড়াও জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে যা নির্বাচিত আসনের আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পরই নির্বাচন প্রক্রিয়া অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজকর্ম শুরু হয়। এ কাজের তালিকার মধ্যে আছে– ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই প্রভৃতি। প্রার্থীদের প্রতীক বণ্টন, ব্যালট পেপার ছাপানো, ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ, ব্যালট বাক্স বিতরণ, ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা, ফলাফল ঘোষণা প্রভৃতি নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে এ সকল কাজ সম্পাদিত হয়।

নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ

নির্বাচন কমিশনের গঠন

বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কমিশন স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করে। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারদের নিয়োগদান করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনাররা রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে কমিশনাররা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কাজ

নির্বাচন কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করে। ভোটার তালিকা বিষয়ক কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কমিশন এর নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত দেয়। কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করে। এছাড়াও সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের জন্য সহায়তামূলক কাজ করে।

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে। সীমানা বিতর্কের অবসান ঘটাতে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। কমিশনই নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করে।

নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাই করার দায়িত্ব কমিশনের। মনোনয়নপত্র বাছাই সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উপ-নির্বাচনের দায়িত্ব কমিশন পালন করে। কোনো সংসদ সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে কমিশন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী ও আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

নির্বাচনি আচরণবিধি

নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাচনি আচরণবিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. **নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবিধান পালন** : নির্বাচন সংক্রান্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান অবশ্যই সকলকে মেনে চলতে হবে।

২. **কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা বা অনুদান প্রদান নিষিদ্ধ** : নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী তাঁর নির্বাচনি এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না। নির্বাচনি এলাকার কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করাও যাবে না।

৩. **নির্বাচনি প্রচারণা**

৩.১ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। প্রতিপক্ষের কোনো সভা, শোভাযাত্রা ও প্রচারে কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না।

৩.২ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে জনসভা করা যাবে না।

৩.৩ সভা বা মিছিলে কেউ বাধা প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে হবে। প্রার্থী নিজে এবং তার সমর্থকরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছু করতে পারবে না।

৩.৪ রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সরকারি প্রচারপত্র, সরকারি যানবাহন, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহায়তা কিংবা রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না।

৩.৫. কোনো প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের ওপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।

৩.৬. রাস্তা বা সড়কের উপর নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না।

৩.৭. সরকারি ডাকবাংলো, সার্কিটহাউস, রেস্টহাউস ও সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৩.৮. নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, বাড়িঘর বা কোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা যাবে না। কারও শান্তি ভঙ্গ হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

৩.৯. সকল প্রকার দেয়াল লিখন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

৩.১০. ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমার মধ্যে মোটরসাইকেলসহ যান্ত্রিক যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন আইনত দণ্ডনীয়।

৩.১১. প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনি কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

৩.১২. ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।

৪. **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা :** অর্থ, অস্ত্র, পেশিশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না।

৫. **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার :** কেবল নির্বাচনি কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। কোনো প্রার্থীর বা দলের কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

৬. **নির্বাচনি অনিয়ম :** আচরণ বিধিমালার যে কোনো বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। কোনো প্রার্থী বা দল এর প্রতিকার পেতে চাইলে নির্বাচনি এলাকাধীন 'ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি' বা নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করতে হবে।

নির্বাচনি অপরাধ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচনি অপরাধ ও এর দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে অপরাধসমূহ ও দণ্ডগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

> **কাজ**
> দলগত : নির্বাচনি আচরণ ভঙ্গের প্রকৃতি চিহ্নিত কর।

ক. নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়ের বিধান লঙ্ঘন করা।

খ. ঘুষ গ্রহণ করা।

গ. জাল ভোট দেওয়া বা ছদ্মনামে ভোট দেওয়া।

ঘ. নির্বাচনে প্রভাব খাটানো, জোর জবরদস্তি করে ভোট আদায় করা বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করা।

ঙ. প্রার্থী বা তার আত্মীয়স্বজনের চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

চ. কোনো প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

ছ. কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

জ. জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি কারণে কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদান সম্পর্কে বলা।

ঝ. ভোটকেন্দ্রের কোনো ভোটারকে ভোট না দিয়ে যেতে বাধ্য করা।

ঞ. বেআইনী আচরণ করা এবং

ট. সভা ও মিছিলের ওপর আরোপিত নিষেধ লঙ্ঘন দুর্নীতিমূলক অপরাধ। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স নষ্ট করা, কেন্দ্র হতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ব্যালট পেপার জাল করা, ভোটকেন্দ্র দখল এবং ভোটপ্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও গুরুতর নির্বাচনি অপরাধ।

নির্বাচনি অপরাধের দণ্ড

উপরোক্ত যে কোনো অপরাধের জন্য জরিমানাসহ ক্ষেত্র বিশেষ সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং কমপক্ষে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। এ সকল নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা করা যায়। তবে নির্বাচন কমিশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যাবে না।

কাজ

দলগত : তোমার নির্বাচনি এলাকার কোনো প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তিনি কী ধরনের শাস্তি পাবেন, তা উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রের ধারণা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২. নির্বাচনি আচরণবিধি বলতে কী বোঝায়?

৩. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি তুলে ধর।

২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩. কী আচরণ করলে নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়? আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে মোট কতটি সংসদীয় আসন আছে?

ক. ৩০০টি

খ. ২০০টি

গ. ৪০০টি

ঘ. ৫০০টি

২. গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে–

i. জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পায়

ii. সরকার দায়িত্ব পালনে সচেতন হয়

iii. শাসনব্যবস্থায় নিপীড়নমূলক আচরণ বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিতুলদের ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই সাধারণ সম্পাদক হতে চায়। কেউ কাউকে ছাড় দিতে না চাওয়ায় অবশেষে সবাই মিলে কয়েকজনকে ক্ষমতা অর্পণ করে একজন সম্পাদক বাছাই করার জন্য। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরবর্তীতে তাদের ক্লাবের একজন সাধারণ সম্পাদক বাছাই করে। নতুন সম্পাদক সবার আস্থা অর্জনের জন্য চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে তার দূরদর্শিতার অভাব এবং তার কাছের কিছু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন। ফলে সম্পাদক বাছাই প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লিখ।

খ. নির্বাচন কমিশন কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. মিতুলদের ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বাছাই প্রক্রিয়ার দুর্বলতা নিরসন করতে পারলেই সম্পাদক বাছাই প্রক্রিয়াটি সর্বোত্তম হবে' – মূল্যায়ন কর।